মেজর সাইফ হাসান সিরিজ

ইশতেহার

আবুল ফাতাহ

ভূমিপ্রকাশ

ভূমিকা

'ইশতেহার'র প্লট আমার মাথায় আসে প্রায় ছয় বছর আগে। সেসময় অনলাইনে কিছু অংশ লিখেছিলামও পর্ব আকারে। প্রচুর মানুষ পড়েছিলেন এবং দারুণভাবে গ্রহণ করেছিলেন। এরপর নানান কারণে আর লেখা হয়নি। পাঠকদের উপর্যুপরি অনুযোগের পরও সাধারণত এ অসমাপ্ত গল্পগুলো আর শেষ করা হয়ে ওঠে না আমার। হারিয়ে যায়। কিন্তু ইশতেহার আজ ছয় বছর পর হলেও দুই মলাটের মাঝে আসছে। কারণটা এক কথায় বলতে গেলে—এর প্লট ও গতিময়তা। এই গল্পটাকে আমি কখনই মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারিনি।

পলিটিক্স, সাসপেন্স, উত্তেজনা, টুইস্ট, একশন ইত্যাদি সমস্ত 'থ্রিলিং' উপাদান বিদ্যমান থাকার পরও ইশতেহারকে নিছক থ্রিলার বলা যাবে কিনা এ প্রশ্ন পাঠকের জন্য তোলা থাক।

উপন্যাসের কিছু স্থান, কাল বা পাত্র পরিচিত মনে হতে পারে। কিন্তু এ দায় একান্তই পাঠকের। আমি কেবল নিখাদ 'ফিকশন' লিখতে চেয়েছি।

যেহেতু "ইশতেহার"-এ চড়বেন বলে ঠিকই করে ফেলেছেন, তাই সিটবেল্ট ঠিকঠাক করে বাঁধুন। নতুবা গল্পের বাঁকে ধাক্কা খেয়ে দুর্ঘটনা ঘটার সমূহ সম্ভাবনা আছে।

–জাকির হোসেন

উপক্রমণিকা

ঢাকা, রাত দুটো বেজে চুয়াল্লিশ।

এলাকাটা পরিচিত অভিজাত ধনীদের আবাসস্থল হিসাবে। ধনীদের মধ্যে মোটাদাগে দুটো শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। এক, অভিজাত আর দুই, 'টাকা হলেই রুচি হয় না' ধরনের বাংলা প্রবাদ যাদের কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণির ধনীরা বেশিরভাগই প্রবাসী হয়ে থাকে। এরা অভিজাত এলাকা গোনে না। বাড়ি করবে গ্রামে। সে বাড়ির প্রতিটা রুম হবে আলাদা আলাদা রঙের। লাল-নীল-গোলাপি রঙে রঙিন হয়ে উঠবে গোটা বাড়ি। সৌন্দর্য তাদের কাছে ধরা দেয় কালারফুল হয়ে।

তবে এখানকার কারবার আলাদা। সূক্ষ্মরুচির মানুষদের বসবাস এখানে, কিংবা সূক্ষ্মরুচির ভেক ধরে থাকাদের। মিনিমাল সৌন্দর্যের আধার এমন একটা ক্রিমরঙা সাততলা ভবনের গায়ে স্ট্রিটলাইট আলো ফেলছে। এলাকাটাতে এখনও বসতি ঘন হয়ে ওঠেনি। দেখা যায় দু-তিনটা বাড়ি পরই এক একটা খালি প্লট। তবে দ্রুতই সেগুলো দখল হয়ে যাচ্ছে কংক্রিট-দানবদের হাতে। আশপাশটা প্রায় নিঝুম। মাঝেমধ্যে একটা অ্যালসেশিয়ান ডেকে উঠছে রাতের নীরবতাকে চূর্ণ করে, সাথে তাল মেলাচ্ছে নাইট গার্ডদের হুইসেল। অনেক হোমরা-চোমরাদের বাসস্থান এলাকার নিরাপত্তা জোরদার করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সাততলা ভবনটার টপ ফ্লোরের একটা জানালা নিঃশব্দে খুলে গেল। এতক্ষণ ধরে জানালার কাচে কিঞ্চিৎ বাধাপ্রাপ্ত স্ট্রিটলাইটের মৃদু আলো এবার খোলা জানালা পথে দোর্দণ্ডপ্রতাপে ঢুকে পড়ল। আলোর পিছু পিছু ঢুকল ছায়া। একটা ছায়ামূর্তি। রাতের মতোই কালো আউটফিট পরনে। ফ্ল্যাটের আঁধারে যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল তার গোটা অবয়ব।

ফ্ল্যাটটা বেশ বড়ো। আজকাল যাকে বলা হচ্ছে, ফোর বিএইচকে। চারটার মধ্যে কেবল দুটো বেডরুমই ভেতর থেকে আটকানো। বাকিগুলো স্রেফ

ভেজানো। কোন রুমে কী আছে তা ছায়ামূর্তির নখদর্পণে। এগিয়ে গেল সে একটা কামরা লক্ষ্য করে। হাঁটার ভঙ্গি চিতার মতো। এতটুকু শব্দও হচ্ছে না।

কয়েক সেকেন্ড পরই যে রুমটাতে সে উপস্থিত হলো সেটাকে দেখামাত্রই স্টাডিরুম হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। বেডরুমকে স্টাডি বানানো হয়েছে। চারটা র‍্যাক বইয়ে ঠাসা। বইগুলোর নামের ওপর চোখ বোলালেই মালিকের জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। আর এক র‍্যাক ভরতি বিভিন্ন নথি, ফাইল ইত্যাদি দিয়ে।

আগন্তুকের সেদিকে আগ্রহ নেই। সে তাকিয়ে আছে গোদরেজের তৈরি ভারি সিন্দুকটার দিকে। এত সুরক্ষিত লকার সচরাচর দেখা যায় না। তবে লকারের দৃঢ়তা আগন্তুকের দৃঢ়তায় ফাটল ধরাতে পারল না। শান্ত ভঙ্গিতে সে বসে পড়ল লকারের সামনে। পিঠে বাঁধা ন্যাপস্যাক নামিয়ে কয়েকটা জিনিস বের করল। দু'ঠোঁটের মাঝে একটা পেন্সিল টর্চ গুঁজে নিয়েছে। টর্চটা শুধু নির্দিষ্ট জায়গাতেই আলো ফেলছে, আশেপাশে ছড়াচ্ছে না।

কাজ শুরু করে দিলো আগন্তুক। ঘড়ি ধরে ছয় মিনিটের মাথায় মৃদু *কিট* আওয়াজ করে খুলে গেল ভারি লকারটা। সন্তুষ্টির একটা হাসি ফুটে উঠল আগন্তুকের ছায়া ঢাকা ঠোঁটে।

ভেতরে দেখা যাচ্ছে টাকার বেশ কয়েকটা বান্ডিল। তবে আগেই বান্ডিলে হাত দিলো না সে। খুটিয়ে খুটিয়ে লকারের ভেতরটা দেখছে। হঠাৎ তার চোখ আটকে গেল একতাড়া কাগজের দিকে। বেশি না, মাত্র চার-পাঁচ পাতা।

আগন্তুকের ভ্রু অজান্তেই কুঁচকে উঠল। একবার ঘুরে কাগজপত্র রাখার র‍্যাকের দিকে তাকালো সে। *ওখানে না থেকে কাগজগুলো এই সুরক্ষিত লকারে কী করছে?* টর্চের মৃদু আলোতে চোখ বোলাতে লাগল কাগজগুলোর ওপর।

মুহূর্তেই তার নিশ্বাস ঘন হয়ে উঠল। অন্ধকারে দেখা না গেলেও তার চোখগুলো নিশ্চিতভাবেই বিস্ফারিত হয়ে গেছে। এবার চোখ বোলানোয় ক্ষান্ত দিলো সে, গভীর মনোযোগ দাবি করে ডকুমেন্টগুলো। যদিও মনোযোগ ধরে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর যখন পুরো ফাইলটা পড়া হয়ে গেল তখন তার অন্তরে শুধু একটাই প্রার্থনা—*হায় ঈশ্বর, এগুলো যেন মিথ্যা হয়!*

এক

"ওরা সবাই এতদিন আপনাকে বলেছে, দেশটা নাকি মা। কিন্তু এই দেশ আমাদের মা নয়।"

পিনপতন নীরবতা নেমে এলো জনাকীর্ণ মাঠটাতে। যেন একযোগে থমকে গেল ঝালমুড়িওয়ালার ডিব্বা, রিকশার প্যাডেল এবং কচি শশায় বসানো ছুরি।

"অবাক হচ্ছেন?" আবার মাইকে প্রতিধ্বনিত হলো ভরাট কণ্ঠস্বরটা, "হওয়াই স্বাভাবিক, এতদিন তো সবাই এ কথাই বলে এসেছে। কারণ দেশটাকে মা ভাবলে এবং ভাবাতে পারলে চুরি-চামারিতে বেশ সুবিধা হয়। মায়ের আঁচল থেকে চুরি করা দু'টাকার নোটটা কখন যে দু'হাজার কোটি টাকায় পরিণত হয় বুঝতেই পারবেন না। এবং এ কাজটা তারা কোনো লজ্জা ও অপরাধবোধ ছাড়াই করে। মায়ের টাকা চুরি করতে আবার কীসের লজ্জা! কিন্তু এই নির্লজ্জ মানুষটারও বুক কাঁপবে তার শিশু সন্তানের হাত থেকে কিছু কেড়ে নিতে। তাই আজ থেকে দেশকে মা নয়, সন্তান ভাবতে শিখুন। বৃদ্ধ মাকে মানুষ ফেলে দেয় এমন খবর আমরা হররোজই দেখি। কিন্তু নিজের সুস্থসবল ফুটফুটে সন্তানকে? কখনই না। দেশটাকেও সন্তান ভাবুন, বয়স পঞ্চাশ হলেও যে সন্তান সবে হাঁটতে শিখেছে। তার হাত ছেড়ে দেবেন না, আঙুল ধরে দৌড়াতে শেখান, কোলেপিঠে করে গড়ে তুলুন। দেশ বড়ো হলে সেও একদিন আপনার সমস্ত ভালোবাসা ফিরিয়ে দেবে সন্তানের মতোই।"

ড. আসাদ কায়সার। একহারা ঋজু দেহকাঠামো। ঝাড়া ছয় ফুট লম্বা মানুষটা। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। গায়ের সাদা পাঞ্জাবির ওপর চড়িয়েছেন ছাইরঙা কটি। জুলফির হালকা রুপালি-ছোঁয়া চুলগুলো তাঁর ব্যক্তিত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকখানি। মুখে ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি।

নিকট অতীতে তাঁর মতো জনপ্রিয় নেতাকে আর দেখেনি বাংলাদেশ। ড. আসাদ কায়সারের বক্তৃতায় মানুষ এমন কিছু শুনতে পায় যা আগে কেউ বলেনি। এ কারণেই হয়তো জনতার একেবারে হৃদয়ে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই তিনি নিজেকে প্রমাণ করেছেন। স্রেফ গলাবাজি করতে যে আসেননি সেটা মানুষকে বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছেন।

দেশ স্বাধীনের অর্ধশতক হতে চলেছে কিন্তু জনগণ পড়ে গেছে পরিবারতন্ত্রের পাকেচক্রে। সেই চক্র ভেঙে আবির্ভাব হয় ড. আসাদ কায়সারের। পেশায় তিনি একজন শিক্ষক। ঢাকার এক নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের প্রধান। হিউম্যান, সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্সের ওপর কেমব্রিজ থেকে পিএইচডি করেছেন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির ওপর ড. আসাদ কায়সারের অগাধ জ্ঞান। পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লেখেন। তিনি মূলত কলাম লেখক হিসাবেই সারাদেশে পরিচিত। অন্তত এতদিন ছিলেন। তাঁর ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ সম্বলিত এক একটা লেখার জন্য স্বয়ং সম্পাদক পর্যায় থেকে অনুরোধ আসে। তাঁর লেখা থাকা মানেই পত্রিকার কাটতি অনেকখানি বেড়ে যাওয়া। বিভিন্ন টকশো থেকে প্রায়ই আমন্ত্রণ জানানো হলেও ক্যামেরার সামনে তাঁকে খুব একটা দেখা যায়নি। প্রচারবিমুখ মানুষ তিনি। মাত্র ক'দিন আগেও দেশের অধিকাংশ লোক যাঁর চেহারা পর্যন্ত দেখেনি সে মানুষটাই আজ হয়ে উঠেছেন দেশের কোটি মানুষের নির্ভরতার জায়গা।

তাঁর রাজনীতিতে আসার প্রেক্ষাপটও খুব অদ্ভুত। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতির অনেকটাই নির্ভর করে প্রতিবেশী দেশের ওপর। ভারত সবসময়ই চেয়েছে বাংলাদেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে। ওদিকে চীনের সাথে ভারতের দা-কুমড়ো সম্পর্ক। তাই চীনও চায় বাংলাদেশে যেন ভারতের প্রভাব কিছুতেই বিপদসীমা অতিক্রম না করে। এজন্য নানানভাবে বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক মজবুত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। এরইমধ্যে ভারত একটা দাঁও মেরে বসে। বাংলাদেশের সাথে একটা গোপন সামরিক চুক্তি সাক্ষর করে যার অধীনে তারা বাংলাদেশে একাধিক সেনাঘাঁটি নির্মাণ করবে।

জনগণ একটু ধাক্কা খেলেও খুব একটা অবাক হয় না। কারণ অতীতে ট্রানজিট, রামপালের মতো এমন অনেক আত্মঘাতী চুক্তিই হয়েছে। তবে ভয়াবহতা নিয়ে কেউ তেমন কিছু বলার সাহস পাচ্ছিল না। কিছু বুদ্ধিজীবী টকশোতে গিয়ে মৃদু গাঁইগুই করলেন বটে কিন্তু তাতে সরকারের থোড়াই কেয়ার। এমন সময় ভিসুভিয়াসের মতো ফেটে পড়লেন আসাদ কায়সার। পত্রিকায় কলাম লেখা দিয়ে শুরু করলেন। কিন্তু কলামগুলোর ভাষা ধারালো হওয়ামাত্রই পত্রিকাওয়ালারা সেগুলো ছাপতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। আসাদ কায়সার বেছে নিলেন অনলাইন। ফেইসবুক, টুইটার, নিজস্ব ব্লগে ঝড়

তুললেন। তরুণদের মধ্যে মুহূর্তেই তুমুল জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন তিনি। দেখাদেখি গজিয়ে গেল প্রচুর পেজ, গ্রুপ, ইভেন্ট। মিডিয়ার সাহায্য ছাড়া কীভাবে একা একজন মানুষ এভাবে আগুন লাগিয়ে দিতে পারেন তা আগে কেউ কল্পনা করেনি। সরকার নড়েচড়ে বসতে না বসতেই এবার তিনি সরাসরি ময়দানে নামলেন। ঢাকায় এক সমাবেশ ডেকে বসলেন। সরকার ভেবেছিল, কতই আর মানুষ হবে। অনুমতি দিয়ে দেয়। কিন্তু সরকারের মতোই আসাদ কায়সারও ধারণা করতে পারেননি, সমাবেশ আসলে মহাসমাবেশে পরিণত হবে। স্মরণকালের অন্যতম বড়ো মহাসমাবেশটি আসলে ছিল কোটি মানুষের দীর্ঘদিনের চেপে রাখা ক্ষোভের বিস্ফোরণ। আসাদ কায়সারের ভাষণ যেন এফোঁড়ওফোঁড় করে দিলো উপস্থিত জনতার হৃদয়। অবশেষে প্রবল চাপের মুখে সরকার চুক্তি বাতিল করে। কিন্তু এখান থেকেই শুরু এক নতুন উপাখ্যানের।

ইতোমধ্যেই ড. আসাদ কায়সারের নির্মোহ চরিত্র সবার মনে ঠাঁই করে নিয়েছে। সুশীল সমাজ থেকে শুরু করে তরুণ প্রজন্মের চোখে নায়কে পরিণত হয়েছেন তিনি। প্রচারবিমুখ যে মানুষটা শুধুমাত্র দেশের জন্য আপামর জনসাধারণকে নিয়ে রাস্তায় নামতে পারেন তাঁর সম্পর্কে জনমানুষের ধারণা অত্যন্ত উঁচু হবে বৈকি। মিডিয়াও পালের হাওয়া বুঝতে পেরে আসাদ কায়সারকে প্রচুর কাভারেজ দিলো।

এছাড়াও তাঁর আরও কিছু গুণ আছে। তিনি সাম্প্রদায়িকতার বেড়াজাল ছিন্ন করতে পেরেছেন যা কিনা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত বিরল একটা ঘটনা। সব সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে তাঁর সমান গ্রহণযোগ্যতা। সবার একটাই আবদার, সরাসরি রাজনীতিতে নামতে হবে তাঁকে। এমনকি সমাজের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দও একাধিকবার তাঁর কাছে গিয়ে আসন্ন নির্বাচনে দাঁড়াবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। তবে প্রতিবারই বিনয়ের সাথে সবার অনুরোধ ফিরিয়ে দিয়েছেন ভদ্রলোক। তিনি পড়াশোনা নিয়েই থাকতে চান। ঠিক তখন এগিয়ে এলেন একজন মানুষ। দিনরাত এক করে আসাদ কায়সারকে রাজি করালেন রাজনীতির রাজপথে পা রাখতে।

"জনবন্ধু" নামে একটি রাজনৈতিক দল সদ্যই নিবন্ধিত হয়েছে। আর নিবন্ধিত হবার আগেই পেয়ে গেছে জনগণের নিরংকুশ সমর্থন। সারাদেশ থেকে বাছাই করে করে সেরা লোকটাকেই নিজের পার্টির জন্য মনোনয়ন দিয়েছেন ড. আসাদ কায়সার। জনবন্ধু পার্টির প্রতিনিধিরা বলতে গেলে সবাই নতুন হলেও রাজনীতি সম্পর্কে তাঁদের ধারণা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সৎ। সবাই নিজ

নিজ এলাকার সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। অত্যন্ত যাচাই-বাছাই করেই এদের মনোনয়ন দিয়েছেন তিনি। আর কয়েকদিন পরই জাতীয় নির্বাচন। ড. আসাদ কায়সারের প্রধানমন্ত্রী হওয়া এখন কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র।

এখনও মাঝেমধ্যে চিন্তা করে কূল পান না তিনি; একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে কী থেকে কী হয়ে গেল! ক'দিন আগেও তিনি ছিলেন একজন সাধারণ অধ্যাপক আর আজ হতে চলেছেন দেশের সবচাইতে ক্ষমতাবান মানুষ। হয়, এরকমই হয়। অনেক রাষ্ট্রনায়কই উঠে এসেছেন একেবারে শূন্য থেকে, অপ্রত্যাশিতভাবে।

তবে তাঁর এই যাত্রাপথে সবাই যে ফুলের তোড়া হাতে স্বাগত জানিয়েছে, তা মোটেও নয়। সেটা কবেই বা হয়েছে? অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক প্রোপাগান্ডা চালিয়ে আসছে। তাদের সংখ্যাটাও নেহায়েত কম নয়। শুধু প্রোপাগান্ডা এমন কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি করতে পারত না ড. আসাদ কায়সারের। সমস্যা দেখা দিয়েছে অন্য জায়গায়। তাঁকে হত্যা করবার জন্য ইতোমধ্যেই একবার চেষ্টা চালানো হয়েছে।

...খুব শীঘ্রই হয়তো আরও একবার হতে যাচ্ছে।

আসাদ কায়সার এখন তাঁর মনোনীত প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছেন। ছুটে যাচ্ছেন দেশের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্ত। প্রতিটা সমাবেশ লোকে লোকারণ্য। তাঁর বক্তৃতা শেষ হলে উপস্থিত জনতা আরও একবার উপলব্ধি করতে পারে, এই মানুষটার ওপর নির্ভর করে তারা কোনো ভুল করেনি।

আজ তিনি রাজধানীর একটি ব্যস্ত এলাকায় নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছেন। যথারীতি এখানেও লোকে থৈ থৈ।

উত্তরার একটি মাঠে সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। মাঠ অনেক আগেই ভরে গেছে। লোকজন রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। রাস্তার পাশের ফুটপাত দখল করে আছে উৎসুক জনতা। তবে রাস্তায় নামতে সাহস পাচ্ছে না কেউ। ড. আসাদ কায়সারের স্বভাব সবার জানা। রাস্তা দখল করে সমাবেশ তার একেবারেই না-পছন্দ। কিছুদিন আগে এক জায়গায় বক্তৃতা চলাকালীন তিনি বুঝতে পারলেন, সমাবেশস্থলের পাশের রাস্তা ব্লক হয়ে গেছে প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে। সাথে সাথে বক্তৃতা বন্ধ করে স্টেজ থেকে নেমে পড়েন। সমাবেশ সেখানেই সমাপ্ত। এরপর থেকে মানুষ রাস্তা দখল করে তাঁর বক্তৃতা শোনার সাহস দেখায় না।

আসাদ কায়সারের কণ্ঠস্বর ভরাট। কথা বলার সময় আশ্চর্য দৃঢ়তা ফুটে

ওঠে। প্রতিটি বাক্যে ঝরে পড়ে অদ্ভুত এক সম্মোহনী জাদু। তন্ময় হয়ে শুনতে হয়। এইমাত্র কথাগুলো বলে শেষ করার সাথে সাথেই তুমুল করতালিতে ফেটে পড়ল গোটা সমাবেশস্থল। উপস্থিত জনতার অনেকের চোখেই টলমলে আবেগ।

আসাদ কায়সারের ঠিক পেছনে দাঁড়ানো বয়স্ক মানুষটা সোনালি ফ্রেমের চশমা খুলে হাতে নিলেন। আসাদ কায়সারের রাজনীতিতে আসার পেছনে এই মানুষটার অবদান সবচাইতে বেশি। রাজনীতির মাঠে পা রাখবার আহ্বান যখন আসাদ কায়সার একের পর এক ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন তখন তিনিই এগিয়ে আসেন। দিনরাত লেগে থাকেন আসাদ কায়সারের পেছনে। তাঁকে বোঝাতে লাগলেন, দেশের স্বার্থেই তাঁর এখন হাল ধরা উচিত। অবশেষে বরফ গলল। মানুষটার কথা একবাক্যে ফেলে দেবার মতো অকৃতজ্ঞ নন আসাদ কায়সার। তিনি রাজনীতিতে এলেন আর আশরাফ জামান হলেন জনবন্ধু পার্টির দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা।

আশরাফ জামানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, তিনি একজন জাঁদরেল ব্যবসায়ী। অত্যন্ত রাজনীতি সচেতন মানুষ। পলিটিক্যালি 'ওয়েল কানেক্টেড'। মন্ত্রী এমপিরা তাকে সমঝে চলেন কারণ দুটো প্রধান রাজনৈতিক দলের হাই কমান্ডেই তার বেশ প্রভাব। এ প্রভাব বজায় রাখতেই নিজে কখনও সরাসরি রাজনীতিতে জড়াননি। তবে এখনকার ব্যাপার ভিন্ন। সন্তানসম আসাদ কায়সারের ওপর তিনি নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারেন। তাঁকে দেখলে বোঝা মুশকিল, তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ার মাত্র কয়েক মাসের। জনবন্ধু নির্বাচনে জিতলে বেশ ভালো একটা মন্ত্রণালয় পাবেন তা বলাই বাহুল্য। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, প্রেসিডেন্টও নাকি হয়ে যেতে পারেন ভদ্রলোক। তবে আসাদ কায়সার এসব ব্যাপারে খুবই নির্মম। যোগ্য মনে না করলে নিজের মরহুম বাপকেও পদে বসাবেন না।

এ কথা সত্য, জনবন্ধু পার্টির উঠে দাঁড়ানো আশরাফ জামানের সম্পদেই। তবে এখন আর তার প্রয়োজন পড়ে না। প্রচুর ডোনেশন পাচ্ছে জনবন্ধু। তবে চোখ বুজে যার তার ডোনেশন নেওয়াতে ঘোর আপত্তি আসাদ কায়সারের। দাতার ব্যাপারে যথাসম্ভব খোঁজখবর করেই ডোনেশন গ্রহণ করেন তিনি।

আশরাফ জামানের আরও একটা পরিচয় আছে। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি বিশ বছরের টগবগে যুবক। খুব অল্পদিনেই পাক বাহিনীর আতঙ্কের অন্য নাম হয়ে দাঁড়ায় আশরাফ বাহিনী। এই গেরিলা গ্রুপটার লিডার ছিলেন আশরাফ জামান। দলের সবাই ছিল বীর যোদ্ধা। আশরাফ

জামানের যোগ্য নেতৃত্ব গেরিলা ইউনিটটাকে প্রায় অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছিল।

যুদ্ধের শেষ দিকে তাঁদের জয়রথ অবশেষে থমকে দাঁড়ায়। একটা গেরিলা অপারেশনে গিয়ে আশরাফ জামান দুজন সঙ্গীসহ ধরা পড়েন পাকবাহিনীর হাতে। একসপ্তাহ পর তিনি শত্রু ঘাঁটি থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন কিন্তু তাঁর দুজন সঙ্গীই মৃত্যুবরণ করেন। এদের একজন ছিলেন কায়সার; আসাদ কায়সারের বাবা।

যুদ্ধচলাকালীন আসাদ কায়সারের জন্ম। তাঁকে জন্ম দিতে গিয়ে মা মারা যান। কায়সার সাহেব স্বচ্ছল মানুষ ছিলেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী মারা যাবার পর এতিম ছেলেটাকে চুষে খাবার জন্য হঠাৎ করেই চারপাশে মৌ-লোভী আত্মীয়দের আনাগোনা শুরু হলো। বৃদ্ধা দাদি জানপ্রাণ দিয়ে আগলে রাখছিলেন নবজাতক আসাদ ও তার সহায় সম্বল। কিন্তু সে প্রতিরোধ তাসের ঘরের মতোই ঠুনকো।

যুদ্ধ আশরাফ জামানের কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নেয়। পরিবারের সবাই নিহত হন হানাদার বাহিনীর হাতে। ভগ্ন, বিধ্বস্ত আশরাফ জামান ঠিক করেন এই গ্রামে আর থাকবেন না। জীবনটাকে নতুনভাবে শুরু করার বাজি ধরলেন গ্রামের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে। গ্রামে পড়ে থাকবার মতো কোনো পিছুটান তার আর বাকি ছিল না।

তিনি যেদিন বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে ঢাকা রওনা দেবেন তার আগের রাতে বাল্যবন্ধু কায়সারের মা এসে হাজির হলেন। তাঁর হাত ধরে অনুরোধ করেন ছয় মাসের বাচ্চাটাকে নিয়ে যেতে। অকূলপাথারে পড়ে যান আশরাফ জামান। সর্বস্ব হারানো নিঃস্ব এক মানুষ তিনি। বাচ্চাটাকে কোথায়, কীভাবে রাখবেন? বাচ্চাদের ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান একেবারেই শূন্য। এদিকে ভালোভাবেই বুঝতে পারছেন, বাচ্চাটাকে এখানে রেখে যাওয়া আর মাঝদরিয়ায় ভাসিয়ে দেওয়ার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। দুটোই অগ্যস্ত যাত্রা। অবশেষে রাজি হলেন তিনি। পরদিন আর যাওয়া হলো না তাঁর।

পরবর্তী তিনদিনের মধ্যে আত্মীয়দের প্রবল বাধার মুখেও আসাদের দাদির সহযোগিতায় শিশু আসাদের প্রায় সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দিলেন। তিনদিন পর সেই যে এলেন ও গ্রাম থেকে, আর কখনও ফেরা হয়নি। দুমাস পর আসাদের দাদি মারা গেলে শেষ সুতোটাও কাটা পড়ে যায়। হ্যাঁ, বিগত কয়েক বছরে আসাদের পীড়াপীড়িতে দু-একবার গেছেন বটে কিন্তু তাকে নিশ্চয়ই 'ফেরা' বলে না।

ঢাকায় এসে আসাদ আর নিজের শেষ সম্বলটুকু একত্র করে ব্যবসা শুরু করেন আশরাফ জামান। তখন খুবই অস্থির একটা সময়। কিছু মানুষের আঙুল ব্যবসা করে ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে আর কিছু মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে উদভ্রান্ত। তবে আশরাফ জামানের ভাগ্য বরাবরই ভালো তা পাকবাহিনীর ক্যাম্প থেকে পালিয়ে আসার ঘটনা থেকে আঁচ করা কঠিন না। রাতারাতি না হলেও ব্যবসাতেই তাঁর কপাল খুলল। ঢাকায় আসার দুমাস পরেই বিয়ে করে নিয়েছিলেন। বাচ্চাটাকে একা সামলাতে পারছিলেন না। এরপরের গল্পগুলো শুধু আনন্দেরই।

পরবর্তীতে নিজের একটা ছেলে আর মেয়ে জন্ম নিলেও আসাদ কায়সারকে কখনও সন্তানভিন্ন কিছু ভাবেননি আশরাফ জামান। ব্যবসাতেও দিয়েছেন নায্য ভাগ। আশরাফ জামানের ব্যবসায় পিতৃপ্রদত্ত সম্পদের পুঁজি আছে ভেবে কখনও আত্মশ্লাঘাতে ভোগেননি আসাদ কায়সার। কারণ ব্যবসায় পার্টনার করা সহজ কিন্তু এতিম একটা শিশুকে বুকে টেনে নেওয়া সহজ নয়। তাই রাজনীতির ব্যাপারে পিতৃতুল্য আশরাফ জামানের কথা ফেলে দিতে পারেননি। এখনও নিজের বাবার মতোই শ্রদ্ধা করেন মানুষটাকে। থাকেনও পাশাপাশি ফ্ল্যাটেই।

আসাদ কায়সারের নিজের পরিবার নেই। বিয়ে করেননি তিনি। গোটা ফ্ল্যাটে তিনি আর তাঁর পারসোনাল অ্যাসিস্টেন্ট থাকে। নামে পারসোনাল অ্যাসিস্টেন্ট হলেও সোহেল ছেলেটা আসাদ কায়সারের জন্য সর্বেসর্বা। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডিপাঠ পর্যন্ত সবই করতে হয়। একাধারে সে আসাদ কায়সারের পিএ, সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার, পাবলিক রিলেশন অফিসার, ড্রাইভারিও করতে হয় মাঝেমধ্যে। সোহেল আসাদ কায়সারের রীতিমতো ফ্যান। তাই কাজগুলো তার কাছে আরাধ্য।

একই অবস্থা আশরাফ জামানেরও। গোটা ফ্ল্যাটে দুটোমাত্র প্রাণীর বসবাস। আশরাফ সাহেবের স্ত্রী মারা গেছেন বছর ছয়েক। মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে। একমাত্র ছেলে শামীম পড়াশোনা শেষে এখন কানাডায় স্থায়ীভাবে চলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। নির্বাচনের পরই চলে যাবার ইচ্ছা। দুটো ফ্ল্যাটেরই রান্নাবান্না আর কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য তিনজন লোক আছে। তাদের জন্য ছাদে সার্ভেন্ট কোয়ার্টারের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

সব মিলিয়ে এভাবেই এই মুহূর্তে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মানুষ দুজনের জীবন চলছে।

দুই

পেশাদার খুনি বলতে যা বোঝানো হয় সালাম মোটেও তা নয়। মাঝবয়সি সালাম খুবই নিঃসঙ্গ একজন মানুষ, সেই সঙ্গে ব্যর্থও বটে। তবে একটা জায়গায় সে অব্যর্থ। হাতের টিপ। তরুণ বয়সে আন্তঃজেলা শ্যুটিং কম্পিটিশনে প্রথম হয়েছিল। সুযোগ পেলে হয়তো বড়ো ধরনের কিছু একটা করে ফেলতে পারত। কিন্তু ওই যে ব্যর্থতা, যেটা কখনই তার পিছু ছাড়েনি।

কয়েক বছর আগে একবার একটা আন্ডারওয়ার্ল্ড গ্রুপ তার ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়। লক্ষ্যভেদে সালামের মুন্সিয়ানার খবর জেনে তাকে কন্ট্রাক্ট কিলিংয়ের প্রস্তাব দেয়। সালাম জানত, সে রাজি না হলে উলটো তার পটল তোলার জন্য অন্য কাউকে হায়ার করা হতে পারে। তাছাড়া ওই সময় খুবই আর্থিক দৈন্যতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল সে। সবচাইতে বড়ো কথা এই কাজটা ভালোয় ভালোয় করতে পারলে তাকে আর টাকা পয়সা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। রাজি হয়ে যায়।

তবে সমস্যা হলো, কেউ শ্যুটিং চ্যাম্পিয়ন হলেই যে অবলীলায় সত্যিকারের পিস্তল চালাতে পারবে বিষয়টা তা নয়। সে জন্য তাকে ফায়ার আর্মসের ওপর ক্রাশকোর্স করানো হলো। দ্রুত শিখে নিলো খুটিনাটি অনেক ব্যাপার। এই একটা জায়গাতেই ভাগ্য তার প্রতি কিছুটা দয়াদ্র হয়। কাজটায় উৎরেও গেল। কিন্তু এরপরই সৌভাগ্য ফের মুখ ফিরিয়ে নিলো। এ ঘটনার পরই সেই গ্রুপটা ভেঙে যায়। দলের অন্যান্য সদস্যদের মতো সালামও ছিটকে গেল একদিকে। সাথে রয়ে গেল শুধু একটা পিস্তল আর হাতে একজন মানুষের রক্তের দাগ।

ভেবেছিল কন্ট্রাক্ট কিলিংকেই পেশা হিসাবে নেবে। কিন্তু ব্যর্থতা এখানেও সালামের সামনে মুখ ব্যাদান করে দাঁড়িয়ে রইল। উপযুক্ত কন্ট্রাক্ট না থাকায় এ পর্যন্ত মাত্র তিনটা কাজ পেয়েছে সে। সালাম নিজেও স্বীকার করবে এর আগের তিনটা কাজই খুব সহজ ছিল। তবে আজকেরটা কঠিন না সহজ বুঝতে পারছে না সে।

এর আগে কখনও আজকের মতো প্রকাশ্যে মানুষ খুন করেনি সে। তবে আপাতদৃষ্টিতে আজকেরটা কঠিন মনে হলেও তাকে বলা হয়েছে এটাই নাকি তার জীবনের সবচাইতে সহজ কাজ হতে যাচ্ছে। স্টেজের কাছাকাছি গিয়ে টার্গেটের উদ্দেশে গুলি ছোঁড়ার সাথে সাথেই নাকি কেয়ামত নেমে আসবে। মানুষ স্টাম্পিডের গরুর মতো পাগল হয়ে যাবে। শুরু হবে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। ক্যাওস। এই ক্যাওসের মধ্যে সে স্বচ্ছন্দে পালিয়ে যেতে পারবে। শর্ত একটাই– প্রথম সুযোগেই লক্ষ্যভেদ করতে হবে। দ্বিতীয় কোনো সুযোগ সে পাচ্ছে না। এ নিয়ে তার দুঃশ্চিন্তাও নেই। প্রথমবারেই লক্ষ্যভেদ করবার মতো আত্মবিশ্বাস সালামের আছে।

তাকে আরও বলা হয়েছে, এখানে সিকিউরিটি বলতে শুধু কিছু পুলিশ। এদের থাকা না থাকায় বিশেষ কিছু আসবে যাবে না। সবচাইতে বড়ো ব্যাপার, কাজটায় প্রচুর টাকা পাচ্ছে সে। চাইলেই এ টাকায় নিজের ছোটোখাটো একটা ব্যবসা দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারবে। সেটাই করবে বলে ঠিক করেছে। হাত ধুয়ে ফেলবে এই পাপের জীবন থেকে। অগ্রিম কিছু টাকাও দিয়েছে পার্টি। বাকিটা আজ সন্ধ্যায় কাজ শেষে পেতে চলেছে।

তবে সে প্রফেশনাল হলে একটু খোঁজখবর করত। আর তাহলেই জানতে পারত, তাকে আসলে খুব সহজেই দাবার ঘুঁটি বানানো হয়েছে। আসাদ কায়সারকে খুন করতে পারলেও এখান থেকে সালামের অক্ষত বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা একেবারে শূন্যের কোঠায়। কারণ পুরো সমাবেশস্থলের সিকিউরিটির দায়িত্বে আছে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি *সিক্রেট শ্যাডো*'র ছয়জন এজেন্ট।

আসাদ কায়সারের ওপর প্রথম হামলাটা হয় চারদিন আগে। সেদিন গভীর রাতে নির্বাচনী প্রচারণা শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁর গাড়িটার ওপর অ্যামবুশ চালানো হয়। ভাগ্য জোরে বেঁচে যান আসাদ কায়সার।

পরদিনই অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি সিক্রেট শ্যাডোর ওপর। আসাদ কায়সারের ঘোর আপত্তি ছিল এতে। এসব হামলা-ফামলা নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা সামান্যই।

এমনিতে কাউকে নিরাপত্তা দেওয়া সিক্রেট শ্যাডোর কার্যক্রমের মধ্যে পড়ে না কিন্তু আশরাফ জামানের একান্ত অনুরোধে কাজটা করতে রাজি হয় তারা। সরাসরি চিফকে ধরেছিলেন।

তিনদিন যাবত আসাদ কায়সারের সিকিউরিটির ভার নিজেদের হাতে নিয়েছে সিক্রেট শ্যাডো। বাসা কাম পার্টি-অফিস এবং সমাবেশস্থলে আসাদ কায়সারের নিরবচ্ছিন্ন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাতদিন খেটে চলেছে সিক্রেট শ্যাডোর এজেন্টরা। এ ক'টা দিন কেটে গেছে কোনো ধরনের অঘটন ছাড়াই। সমাবেশগুলোতে ছয়জন এজেন্টের একটা টিম কাজ করে। আজও একই বন্দোবস্ত। এই মুহূর্তে আসাদ কায়সারের দু'পাশে ধনুকের ছিলার মতো টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুজন এজেন্ট। আরও চারজন চক্কর দিচ্ছে পুরো সমাবেশস্থল। চোখে ইগলের দৃষ্টি। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শতভাগ নিরাপত্তা দিতে পারছে না সিক্রেট শ্যাডো। জনে জনে সবাইকে চেক করে সমাবেশে ঢোকানো এক কথায় অসম্ভব। তাই তারা ছড়িয়ে পড়েছে জনসমুদ্র জুড়ে।

***

সালাম একটা ঢিলেঢালা গেঞ্জি পরেছে। কোমরে গোঁজা দেশি পিস্তলটাকে আড়াল করবার প্রয়াস। পিস্তল দেশি হলেও নিশানা খুবই ভালো। সালামের অনেকদিনের সঙ্গী। বিলেতি একটা অটোমেটিক পিস্তলের শখ ছিল সালামের। তবে আজকের পর শখটাকে মাটি চাপা দিয়ে সে মাটির মানুষ হয়ে যাবে।

তার প্ল্যানটা খুবই সাদামাঠা। উপস্থিত লোকজনের মধ্যে দিয়ে স্টেজের একেবারে সামনে চলে যাবে সে। আগেই লক্ষ করে দেখেছে, স্টেজে ওঠার সিঁড়ির মুখে দুজন মাত্র কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। বাকি কজন পুলিশ এদিক সেদিক ভ্যাগাবন্ডের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। সংখ্যায় তারা নিতান্তই অপ্রতুল, অন্তত আসাদ কায়সারের মতো একজনের নিরাপত্তার দিকটা লক্ষ করলে। নির্বাচন উপলক্ষ্যে এখন তত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় থাকলেও তাতে ক্ষমতাসীন সরকারের প্রভাব ব্যাপক। তাই চক্ষুলজ্জা নিবারণ করার মতোই সিকিউরিটি দিয়ে দায়সারা হচ্ছে। যে লোকটা প্রতিনিয়ত তাদের ক্ষমতায় ভাগ বসানোর চোখ রাঙানি দিচ্ছে তাঁর নিরাপত্তা দিতে ওদের বয়েই গেছে! সাধারণ সভা-সমাবেশে যেটুকু নিরাপত্তা থাকে এখানেও তার চাইতে বাড়তি কিছু নেই।

স্টেজে যাদের দেখা যাচ্ছে এরা পার্টির নেতা-কর্মী। তাদের নিয়ে দুঃশ্চিন্তা মোটেও করছে না সালাম। গুলি শুরু হলে এরাই আগে খিঁচে দৌড় দেবে।

সালাম প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্য দিয়ে সামনে এগোতে চাইছে। মাঝেমধ্যেই জোর খাটাতে হচ্ছে তাকে। প্রায় পৌঁছে গেছে স্টেজের কাছে। আরেকটু এগোতে

পারলেই স্টেজের দশ গজের মধ্যে চলে যেতে পারবে সে। আর তাহলেই...

তবে সে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারল না, কেউ একজন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে তাকে।

***

সিক্রেট শ্যাডোর এজেন্ট ফারহান খানিকটা অস্থির স্বভাবের। সবসময় উত্তেজনার খোঁজে থাকে। স্টেজে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে পুরো সমাবেশস্থল নজরে রাখাটাই তার বেশি পছন্দের। সেই কাজটাই করছে সে এই মুহূর্তে। মোট চারজন ওরা। নিজেদের মধ্যে এরিয়া ভাগ করে নিয়েছে। ফারহানের দায়িত্বে আছে স্টেজের সামনে থেকে একেবারে সমাবেশের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত। বাকিরা অন্য দিকগুলো কাভার করছে।

এতক্ষণ স্টেজের দিকে মুখ করে তাকিয়ে ছিল ও। দেখলে মনে হতে পারে গভীর মনোযোগে আসাদ কায়সারের বক্তৃতা শুনছে। যদিও আশেপাশের কোনোকিছুই তার চোখ এড়াচ্ছে না। একটু আগে দেখা একটা ব্যাপার বেশ খচখচ করছে মনে। এক লোককে স্টেজের সামনের দিকে যেতে দেখছে ফারহান। লোকটা বেশ লম্বা, শক্তপোক্ত। নিঃসন্দেহে শরীরে যথেষ্ট শক্তি রাখে। স্টেজের সামনের দিকে যাবার মধ্যে অস্বাভাবিকতা নেই, হয়তো লোকটা আসাদ কায়সারের মাত্রাতিরিক্ত ভক্ত। সমস্যা হলো, লোকটার মধ্যে একটা বেপরোয়া ভাব দেখেছে সে। যেন স্টেজের সামনের দিকে যাবার মধ্যেই তার জীবন মরণ নির্ভর করছে। লোকটার এই ব্যতিব্যস্ততা দেখে সেদিকে মনোযোগ দিতেই আরও একটা বিষয় নজরে এসেছে ফারহানের। এটাও ছোট্ট একটা বিষয় কিন্তু ওর মন কেন যেন কুডাক ডাকছে।

ট্রেনিংয়ে ফারহান শিখেছে, এধরনের পরিস্থিতিতে প্রথমেই একটা জিনিস লক্ষ করতে হবে; সন্দেহভাজনের দেহের কোথাও অস্ত্র লুকাবার মতো জায়গা আছে কিনা। কোট, চাদর কিংবা ঢোলা জামা। প্রফেশনালদের ওপর কৌশলটা কাজে না লাগলেও অ্যামেচারদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কার্যকরী। এই লোকটাও একটা ঢোলা জামা পরে আছে। হয়তো কিছুই না, এরপরও খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিলো ফারহান। পিছু নিলো লোকটার।

***

সালাম পৌঁছে গেছে স্টেজের একেবারে সামনে। স্টেজের সামনের প্রায় দশ গজের মতো জায়গা বাঁশ দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে যেন অতি-আবেগি কেউ স্টেজে উঠে পড়তে না পারে। ঘেরা জায়গাটাতে পার্টির দুয়েকজন লোক ঘোরা ফেরা করতে করতে ইতস্তত এদিক সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। এদের চোখ এড়িয়ে গুলি করাটা কিছুটা মুশকিল। তবে ভরসার কথা, লোকগুলোর মনোযোগ অন্যদিকেই থাকছে বেশি।

কোমরের কাছ থেকে গুলি হয়তো করা যেত কিন্তু তাতে একটা সমস্যা আছে। বক্তৃতারত আসাদ কায়সারের সামনে একটা কাঠের মজবুত ডায়াস। কোমর থেকে ছুঁড়লে তার দেশি পিস্তলের গুলি ঠেকিয়ে দেবার সামর্থ্য আছে ওটার। সেক্ষেত্রে হাত উঁচু করে গুলিটা করতে হবে। একেবারে মাথায়। কোনো সুযোগই দেওয়া যাবে না টার্গেটকে।

সালাম হিসাব করে দেখেছে, কোমর থেকে পিস্তল বের করে ভিকটিমের দিকে তাক করে ট্রিগার টিপতে বড়োজোর দশ সেকেন্ড লাগবে। আশা করতে দোষ নেই, এই দশ সেকেন্ড কেউ তার দিকে মনোযোগ দেবে না। আর কেউ দেখে ফেললেও বাধা দেবার সম্ভাবনা কম। এদেশের মানুষকে তার চেনা আছে। চোখের সামনে ছিনতাইকারী কাউকে লুটে নিতে দেখলেও বাঙালিরা হাই তুলে আরেকদিকে তাকায়। পিস্তল বের করে কাউকে গুলি করতে দেখলে প্রথম দশ সেকেন্ড স্ট্যাচু হয়েই থাকবে যে কেউ। একবার গুলি করা হয়ে গেলে আর কোনো চিন্তাই নেই। দিশেহারা হাজার হাজার জনতার ভিড়ে সে সহজেই হারিয়ে যেতে পারবে। শর্তটাও তার মনে আছে। প্রথম সুযোগেই লক্ষ্যভেদ করতে হবে।

লক্ষ্যভেদের লক্ষ্যে কোমর থেকে পিস্তল বের করল সালাম। লক্ষ্যস্থির করল।

***

কিছুদূর এগোতেই ফারহান উপলব্ধি করল, লোকটাকে হারিয়ে ফেলেছে। যতই ভাবছে ততই ওর মনে হচ্ছে, কিছু একটা ঘাপলা আছে এই লোকের মধ্যে।

ও কখনও মরুভূমিতে যায়নি। তবে পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারছে মরীচিকা দেখার অনুভূতি কেমন হতে পারে। চারপাশে যেদিকে তাকাচ্ছে

সেদিকেই লোকটার দেখা পাচ্ছে ফারহান। সাথে সাথেই ভ্রান্তি কেটে যাচ্ছে। বাকিদের সতর্ক করে দেবার মতো সময়ও নেই। ওর ধারণা যদি সত্যি হয় তাহলে এই মুহূর্তে স্টেজের সামনে চলে গেছে লোকটা। এখন একটা কাজই করার মতো আছে। ওর নিজেরও স্টেজের সামনের দিকে চলে যেতে হবে।

স্টেজের দিকে আসতে আসতে কালঘাম ছুটে গেছে ওর। এখানে পৌঁছেও যে সমস্যার সমাধান হলো, তা নয়। লোকটাকে সে এখনও দেখতে পাচ্ছে না। ডানে-বামে-সামনে-পেছনে মানুষ একেবারে গিজ গিজ করছে। এরমধ্যে আততায়ী কোথায় ঘাপটি মেরে আছে কে বলতে পারে? তাছাড়া সে সত্যি সত্যিই আততায়ী কিনা তা নিয়েও তো সন্দেহ...নাহ, আর কোনো সন্দেহ নেই!

ফারহান দেখতে পেয়েছে ব্যাপারটা। সঙ্গে সঙ্গেই হার্ট একটা বিট মিস করল। ওর ডান দিকে, ফুট বিশেক দূরে একটা হাত ঝটিতে স্টেজ লক্ষ্য করে উঠে গেল। সে হাতে অস্ত্র!

ফারহান এত দূর থেকেও অনুভব করতে পারল, ট্রিগারে লোকটার আঙুল চেপে বসেছে। গুলি ছুটে যাবে যখন তখন।

কিচ্ছু করার নেই ফারহানের। চিৎকার করলেও সেটা মাইকের আওয়াজের নিচে চাপা পড়ে যাবে। তাতে আরও হিতে বিপরীত হবার জোর সম্ভাবনাও আছে। মারাত্মক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। সেক্ষেত্রে ভিড় ঠেলে কোনোমতেই আততায়ীর কাছে যাওয়া সম্ভব নয়।

হঠাৎ করেই অসহায় বোধ করল ফারহান। যেন সে হেঁটে বেড়াচ্ছে অথৈ সাগরে। পায়ের নিচে নেই কোনো নিরেট ভূমি।

***

ফারহান ছাড়াও আরও একজোড়া চোখের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সালামের ব্যতিব্যস্ততা।

এই চোখের মালিক মাত্রই সমাবেশস্থলে উপস্থিত হয়েছে। প্যান্ডেলে ঢোকার মুখেই তার নজরে পড়ে যায় সালাম। অভিজ্ঞ চোখ সালামের অস্থিরতা চিনতে ভুল করেনি। ছায়ার মতো পিছে লেগে গেল সে।

কিছুদূর গিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য হারিয়ে ফেলেছিল সালামকে। যতক্ষণে খুঁজে পেল তখন সালাম স্টেজের কাছে পৌঁছে গেছে।

বুকটা ধড়াস করে উঠল আগন্তুকের। জমাট ভিড় ঠেলে এগোতে শুরু করল

সালামের দিকে। আর যখন দশ ফুটের পথ বাকি তখনই সে দেখতে পেল। পিস্তল ধরা আততায়ীর হাত উঠছে টার্গেট লক্ষ্য করে।

একটা কাজই করার আছে এই মুহূর্তে। তাই করল আগন্তুক।

***

দিশেহারা ফারহান ঘামতে লাগল। চোখের সামনে এত বড়ো ব্যর্থতা কীভাবে দেখবে?

অক্ষম রাগে চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করল তার। কেন লোকটাকে আগে চোখে পড়ল না? কেন হারিয়ে ফেলল তাকে? কেন ঠিক সময়মতো খুঁজে পেল না?

ঠিক তখনই চোখের সামনে একই সঙ্গে ঘটতে শুরু করল কয়েকটা ঘটনা। একেবারে স্লো মোশন ছায়াছবির মতো।

হঠাৎ করে পিস্তলধারী আততায়ীর পেছন দিকের জটলাটা ফাঁক হয়ে গেল। তীরবেগে কেউ একজন ছুটে যাচ্ছে আততায়ীর দিকে। আশেপাশের মানুষগুলোর কেউ কেউ ছুটন্ত লোকটার ধাক্কায় মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু সেদিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ নেই তার। একমাত্র লক্ষ্য অস্ত্রধারী।

আশ্চর্য ব্যাপার, এতগুলো ঘটনা ঘটল অথচ স্টেজের কেউ কিছুই বুঝতে পারেনি। আসাদ কায়সারের বক্তৃতাও বন্ধ হয়নি। এখনও যদি আসাদ কায়সারকে সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে বেঁচে যান ভদ্রলোক। তবে টের না পাওয়াই স্বাভাবিক। এত মানুষের মধ্যে কে কার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে সেটা ঠাহর করা সহজ না।

ছুটন্ত দেহটা ঝাঁপিয়ে পড়ল সালামের ওপর। ঠিক একটা ক্ষীপ্র চিতার মতো। সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুটল আততায়ীর পিস্তল থেকে। আকাশ বাতাস কেঁপে গেল সে আওয়াজে। এক সেকেন্ডের জন্য যেন পজ করে দিলো গোটা এলাকা।

এরপরই শুরু হলো তাণ্ডব।

গুলির ভয়াবহ বজ্রনিনাদে পাগলের মতো ছোটাছুটি করতে লাগল উপস্থিত হাজার হাজার জনতা। তাদের পায়ের আঘাতে উড়ন্ত ধূলো অন্ধকার নামিয়ে আনল। প্রায় অন্ধ হয়ে হাতড়ে হাতড়ে মাটিতে ধস্তাধস্তি করতে থাকা দেহ দুটোর দিকে এগোতে লাগল ফারহান। কালো স্যুট পরা আগন্তুকের অবয়বটা আবছাভাবে নজরে পড়ছে শুধু। এগোতে এগোতেই আরেকটা গুলির শব্দ শুনতে পেল ফারহান। বুক কেঁপে উঠল তার। কারণ এইমাত্র সে

আগন্তুককে চিনে ফেলেছে।

ছুটন্ত মানুষের মাঝ দিয়ে পথ করে এগোতে বেগ পেতে হচ্ছে ফারহানের। কাছাকাছি হতেই দেখতে পেল আততায়ী আগন্তুকের ওপর চেপে বসেছে। এমনিতেই সালাম শক্তিশালী মানুষ তার ওপর আগন্তুকের গলায় চেপে বসেছে তার দুই হাত। তথৈবচ অবস্থা নিচের মানুষটার। হাঁসফাস করছে। পিস্তলটা এক পাশে পড়ে আছে দুজনেরই নাগাল থেকে কিছুটা দূরে। সেটা হাতে পেতে চাইছে সালাম। একবারেই ঝামেলা মিটিয়ে ফেলবে। তবে পিস্তলের দিকে মনোযোগ দেওয়াটাই তার কাল হলো। সামান্য সুযোগ পেতেই আগন্তুক গলায় চেপে বসা একটা আঙুল মুঠো করে ধরে মুচড়ে দিলো ভয়ানকভাবে। এত হুল্লোড়েও হাড় ভাঙার গা শিউরানো আওয়াজটা শুনতে কষ্ট হলো না ফারহানের।

পশুর মতো গোঙাচ্ছে সালাম। এখনও এক হাত দিয়ে ধরে আছে আগন্তুকের গলা। তবে জোর না থাকায় সহজেই হাতটা থেকে গলা ছড়িয়ে নিতে পারল সে। সালামকে একপাশে ঠেলে দিয়েই উঠে দাঁড়ালো।

একইসঙ্গে সালামও উঠে দাঁড়িয়েছে। ভাঙা আঙুলের ব্যথা এবং সেই সাথে ধরা পড়ে যাবার রাগে উন্মাদ হয়ে উঠল সালাম। বুনো মোষের মতো ছুটে গেল আগন্তুকের দিকে।

যেকোনো লড়াইয়ের প্রথম শর্ত হলো মাথা গরম করা যাবে না। নিয়ম ভেঙেছে সালাম। খেসারত তো দিতেই হবে।

সালামকে ষাঁড়ের মতো ছুটে আসতে দেখেও জায়গায় অনড় রইল আগন্তুক। সালাম যখন তার তিনফুটের মধ্যে চলে এসেছে তখন আচমকা নড়ে উঠল। বিদ্যুৎবেগে হাতটা উঠে গিয়ে একটা আপারকাট ঝাড়ল। রাগে অন্ধ সালাম প্রায় উল্টে পড়ল তিন ফুট দূরের ধূলোয়। এবার আর উঠে দাঁড়াবার সুযোগ দিলো না আগন্তুক। কয়েক পা দৌড়ে গিয়ে সালামের তলপেটে ভয়ংকর এক লাথি মেরে বসল। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালো সালাম।

এতক্ষণ হতভম্ব হয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাণঘাতী লড়াইটা দেখছিল ফারহান। শত্রু নিষ্ক্রিয় হতেই এগিয়ে গেল আগন্তুকের দিকে।

"বস, ঠিক আছেন আপনি?"

কপালের ঘাম মুছে নিয়ে মৃদু মাথা ঝাঁকালো মেজর সাইফ হাসান। সিক্রেট শ্যাডোর হেড অব অপারেশন। ভ্রু কুঁচকে আশপাশটা পরখ করে দেখছে বিপদের সম্ভাবনা এখনও আছে কিনা।

"বস, গুলির আওয়াজগুলো...?"

"মিস ফায়ার।" জবাব দিলো সাইফ।

হাঁপ ছাড়ল ফারহান। দেখতে পেল ওদের টিম লিডার মাসুদ দৌড়ে আসছে।

"কখন এলেন?" এসেই তড়িঘড়ি জানতে চাইল মাসুদ।

"এইমাত্রই। অফিসে কাজ ছিল না। ভাবলাম, তোমাদের সিকিউরিটি সেটআপটা দেখে যাই। এসেই নজরে পড়ল একে," মাটিতে পড়ে থাকা দেহটার দিকে ইশারা করল সাইফ, "এমনিতে সন্দেহের বশেই পিছু নিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, গড়বড় আছে। ভাগ্যিস মনে হয়েছিল!" শেষের কথাটা হালকা চালে বলেই ফের গম্ভীর হয়ে গেল সাইফ, "টার্গেটের কী অবস্থা?" আসাদ কায়সারের কথা জিজ্ঞেস করছে সাইফ।

"সেফ। বাকিরা গার্ড দিয়ে গাড়ির কাছে নিয়ে গেছে।"

"হুম," মাথা দোলালো সাইফ। "তোমাদের আরও সতর্ক থাকার দরকার ছিল।" স্রেফ এতটুকুই বলল। ও জানে, এটা নিছক দুর্ঘটনা। কারো অবহেলা দায়ী নয় এর পেছনে।

"বস, আপনি কি আসাদ কায়সারের সাথে কথা বলবেন?"

জবাব দেওয়ার আগে সামনে তাকালো সাইফ, একজন পুলিশ উঁকিঝুঁকি মারছে। স্টেজের পাশে যে দুজন কনস্টেবল ছিল তারা গোলাগুলি শুরু হতেই পালিয়েছে।

"এখন না। এখানে তাঁর থাকাটা নিরাপদও নয়। তোমরা চারজন তাকে বাড়িতে নিয়ে যাও। আর দুজন একে হেড কোয়ার্টারে দিয়ে এসো," সালামকে দেখালো সাইফ, "ইন্টারোগেট করতে হবে। পুলিশ এখনও সম্ভবত বুঝতে পারেনি কালপ্রিট কে।"

"ওকে, বস।"

কথা শেষ হতেই ঘুরে দাঁড়ালো সাইফ। এখন ওর বাসায় ফিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার ইচ্ছা। গত কয়েকদিন ধরে কাজের মারাত্মক চাপ যাচ্ছে। প্রতিদিনই অনেক রাত কাজ পর্যন্ত কাজ করতে হয়। ওর এজেন্সির সবাই প্রায় নতুন। ওকেই শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হচ্ছে। তবে মানতেই হবে, ছেলেগুলো দেশ আর এজেন্সির প্রতি নিবেদিত প্রাণ। এদের জোরেই তো সিক্রেট শ্যাডোর মতো সম্পূর্ণ ইউনিক কনসেপ্টের একটা প্রতিষ্ঠান একটু একটু করে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে।

সাইফ ওর গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিতে যাবে এমন সময় ফোন বেজে উঠল।

হেড কোয়ার্টার থেকে এসেছে।

"হ্যালো," রিসিভ করল সাইফ। ফোন করেছে অ্যানালাইসিস উইংয়ের প্রধান সাবের হুসাইন।

"ভাইয়া, আপনাকে একটু আসতে হবে অফিসে। আশ্চর্য একটা মেসেজ এসেছে এইমাত্র।"

"কেমন আশ্চর্য মেসেজ? খোঁজ নিয়ে দেখেছো ব্লাফ কিনা?"

"নিয়েছি। তবে আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা জরুরি। আপনি আসবেন একবার?"

সাবের ফালতু কথার মানুষ না। কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে এর মধ্যে।

"আমি আসছি।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গাড়ি স্টার্ট দিলো সাইফ।